পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সন্তানকে শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে হবে

সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য তাকে শৃঙ্খলাবোধ শেখানো খুব জরুরি। এই ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। তারপর একটি শিশুকে সঠিক শৃঙ্খলাবোধ-নিয়মনীতি শেখানোর দায়িত্ব বর্তায় একজন শিক্ষকের উপর। কারণ একটি শিশুর কাছে বাবা-মায়ের পরেই সবথেকে নির্ভরতার জায়গা হলেন একজন শিক্ষক।

সন্তানকে শৃঙ্খলাবোধ শেখানোর জন্য প্রথমে তার কাছে নিজেকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলুন। নিজে এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে সে আপনাকে দেখে নিজেদের মধ্যে অন্য ধরনের ধারণা তৈরি করে। বাড়ির ছোট সদস্যটিকেও সম্মান দিতে চেষ্টা করুন তবেই সে আপনাকে সম্মান দেবে। সব সময় এটা ভাববেন না যে বাড়ির ক্ষুদেটির সঙ্গে যেমন-তেমন ব্যবহার করলে কোনও অসুবিধে নেই। মনে রাখবেন সে কিন্তু সবকিছু নজরে রাখে। আর বাচ্চারা যা দেখে তাই শেখে। সে অন্যায় কাজ করলে সকলের সামনে তাকে না বোকে আলাদাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করুন। এতে সে জিনিসটি বুঝতে পারবে। সন্তানকে শৃঙ্খলাবোধ শেখানোর আগে নিজে শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া জরুরি। বাচ্চা কিন্তু আপনাকে দেখেই শিখবে। এমন না হয় যে আপনি বাচ্চাকে শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে গিয়ে মুখে

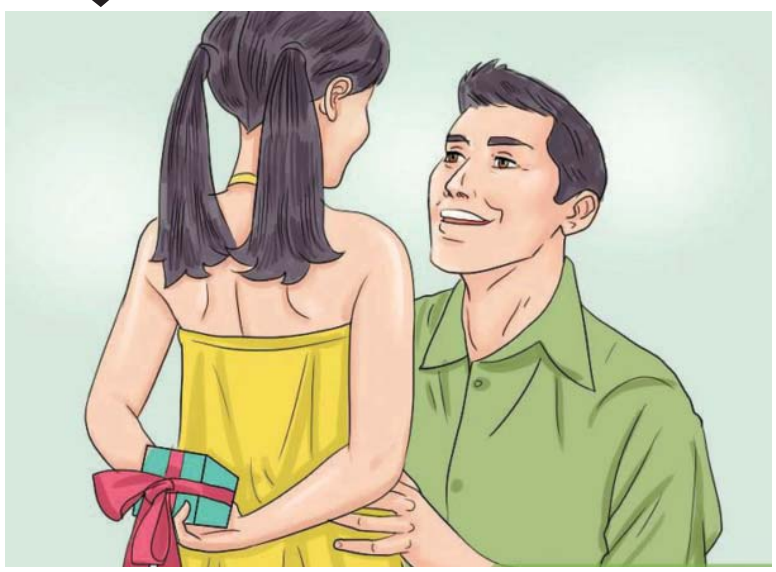

এক কথা বলছেন অথচ নিজে সেই কাজটি করার সময় উলটোটা করছেন। যেমন, নিজে ঘরে যে প্লেটটিতে খাবেন সেটি নিজে তুলে রাখুন, ঘরে টিভি চালিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। কারণ আপনার সন্তান সমস্ত বিষয়টি নজরে রাখছে সেটি মনে রাখবেন।

বাড়ির বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে বা তাঁদের সমালোচনা করলে তার প্রভাব শিশুটির ওপর পড়বে। একটি শিশু একটি মাটির তাল। তাকে শেখানোর সমস্ত দায়িত্ব আপনারই। আপনাকে আপনার ক্ষুদেটির সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তার মধ্যে কোনও অসংযত আচরণ তৈরি না হয়। সে যেন আপনার কথা বুঝতে পারে।

একটি শিশুকে শাসন করার বিষয়টিকেও খেয়াল রাখুন। ধরুন একজন শাসন করছে, আর একজন তারই মাঝখানে গিয়ে ওই শিশুটিকে আদর করছে। এটি মোটেও ঠিক নয়। বরং তাকে বকাঝকা না করে শিশুটি কোনও অন্যায় করলে তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত। আর বকাঝকার মাঝখানে একজন যদি তাকে প্রশয় দেয় তাহলে তার মধ্যে আলাদা করে একজনের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে। সেইসঙ্গে একজন শিশুকে শাসন করার সময় খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে যে ভুলটা ভুলই। তবে তাকে শাসন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অযথা কোনও সমস্যা ডেকে আনবেন না। এতে আসল সমস্যাটাই মিটবে না, উলটে শিশুটি আপনাদের ব্যবহার দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে। সেইসঙ্গে একজন শিশুকে কারওর সঙ্গে তুলনা করবেন না, বা তাকে কোনও অপমানজনক কথা বলবেন না যাতে তার খারাপ লাগে। এতে নিজের মধ্যে ক্রমশ তার আত্মবিশ্বাস কমতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় নিজের সন্তান পরীক্ষায় কোনও বিষয় কম নম্বর পেলে তার বন্ধুর সঙ্গে তুলনায় হয়। কারণ তার বন্ধু তার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। সে কেন পেল না?

এরপর সাতের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
এডু নিউজ
জেনারেল নলেজ
তিনের পাতায়
এডু টিপস
স্পেশাল টিউশন
বাংলা ব্যাকরণ
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস এইট-এর টিউশন
বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভৌতবিজ্ঞান
ছয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
বাংলা সিনেমা
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
এডু অ্যাডভাইস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
প্রাকৃতিক বিস্ময়

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

ইংরেজিতে জোর দাও

সুপর্ণা দত্ত শিক্ষিকা,
বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস

আমি মনে করি একজন পড়ুয়ার ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে। আর সমস্ত সমস্যা লুকিয়ে আছে ওই প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই। প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি করে নজর দেওয়া উচিত। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, একজন পড়ুয়া ঠিকমতো বাক্য গঠন করতে পারছে না। সেটি ইংরেজিতে হোক বা বাংলায়। কারণ তাদের ভিতটাই কাঁচা থেকে যাচ্ছে। প্রতি বছরই এই ধরনের সমস্যা বাড়ছে। ছোট ছোট বাক্য গঠন করা, বাংলাতে, ইংরেজিতে Make sentence-এর অভ্যাসটা কমে যাচ্ছে। ইংরেজিতে একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে দিলে তারা সঠিক ভাবে সেগুলি লিখতে পারে না। Make Sentence প্রাথমিক স্তর থেকে চালু করলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হবে। পড়ুয়ারা ছোট থেকেই যদি এরকম ছোট ছোট বাক্য গঠন করার অভ্যাস করে তাহলে ভালো হয়।

শুনে শুনে লেখা যাকে বলা হয় শ্রুতিলিখন ও Spelling dictation- একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই বিষয়েও সমস্যা রয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

তবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মেধা একরকম নয়। সকলেই যে পড়াশোনা ভালোবেসে বা বুঝে করে এমনটা নয়। অনেক পড়ুয়া আছে বিদ্যালয়ে আসতে হয় বা পরীক্ষা দিতে বলে স্কুলে যায় এবং পরীক্ষা দেয়। এর ফলে তাদের রেজাল্টও খারাপ হয়।

এরপর চারের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

বড় হয়ে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে চাই

স্বর্ণালি ঘরামি সপ্তম শ্রেণি, বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস (উঃমাঃ)

জীবনে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী স্বর্ণালি ঘরামি। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে। বাবা চাষি। কষ্টের মধ্যে দিয়েই তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা। ছোট্ট থেকেই স্বর্ণালি জেনে গেছে জীবনে তাকে লড়াই করে বড় হয়ে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারণ স্বর্ণালি তার এইটুকু বয়সেই বুঝে গেছে, একমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে আলোর পথ দেখাতে। শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে এই আলো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। এই স্বপ্নের পাশে স্বর্ণালি পেয়েছে তার সমস্ত শিক্ষিকাকে।

উত্তরণ: এই স্কুলে কবে থেকে পড়াশোনা করছ?

স্বর্ণালি: ক্লাস ফাইভ থেকে।

উত্তরণ: স্কুলে বাইরে বাড়িতে কতক্ষণ সময় ধরে পড়াশোনা করো?

স্বর্ণালি: স্কুলের সময় সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.৩০ টে।

বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পড়াশোনা করি। এছাড়া গৃহশিক্ষকের কাছেও পড়াশোনা করি।

উত্তরণ: পড়াশোনার বিষয়ে স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছ থেকে কীরকম সাহায্য পাও?

স্বর্ণালি: স্কুলের শিক্ষিকারা সব সময় পাশে থাকেন। কিন্তু আমার বাড়িতে সেইভাবে আমাকে পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্য করার কেউ নেই। তাই সব বিষয়ে আমাকে গৃহশিক্ষকের কাছে সাহায্য নিতে হয়।

উত্তরণ: পড়া মনে রাখার জন্য কি করো?

স্বর্ণালি: খুব ভালো ভাবে বুঝে পড়ি। না বুঝলে বার বার পড়ি। তারপর লিখে অভ্যাস করি। এতে পড়া খুব ভালো করে মনে থাকে। নোটস ছাড়াও পাঠ্য বিষয়গুলি ভালোভাবে পড়ি।

উত্তরণ: তুমি তোমার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কী বলতে চাও।

স্বর্ণালি: বলব, পাঠ্য বিষয়গুলি মন দিয়ে পড়তে। এছাড়া লেখার অভ্যাস বজায় রাখতে।

উত্তরণ: পড়াশোনা ফাঁকে অবসর সময়ে কি কর?

স্বর্ণালি: গল্পের বই পড়ি।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

স্বর্ণালি: শিক্ষিকা।

উত্তরণ: জীবনে তুমি সফল হও।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

এডু নিউজ

মানবশরীরে কৃত্রিমভাবে বুদ্ধি বাড়ানো সম্ভব

বিজ্ঞান আমাদের জীবনে এক আশীর্বাদ একথা অনস্বীকার্য। নানারকম আবিষ্কার আমাদের জীবনকে শুধু এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি নানাভাবে আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করেছে। এককথায় বলতে গেলে বলা যায়, বিজ্ঞান না থাকলে মনুষ্য জীবন পঙ্গু। অনেকের মতে, বিজ্ঞান আমাদের জীবনের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু তা হলেও বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে যা উপহার দিয়েছে তার জন্য মানবজীবন চিরকাল বিজ্ঞানের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। একের পর এক বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের চোখকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যা আমাদের কাছে এক সময় আশ্চর্য বলে মনে হত তা আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের যেমন মহাকাশ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে তেমনি নানা ধরনের জটিল রোগের ওষুধের আবিষ্কার আমরা বিজ্ঞানের হাত ধরেই আমরা পেয়েছি। পাশাপাশি এমন অনেক কিছুই আছে যেগুলিকে বিজ্ঞানের দৌলতেই সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে মানুষের জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান আমাদের সামনে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যেটা ভাবলেই অবাক লাগে। কিছু বছর আগে যেটা হয়তো কেউ ভাবতেই পারত না, সেটা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের দৌলতে কৃত্রিমভাবে বুদ্ধি বাড়ানোও সম্ভব। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি। বিজ্ঞানের দ্বারা যে কিছুই অসম্ভব নয়, একথা হলফ করে বলা যায়। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি এবং গোল্ডস্মিথস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা দাবি করেছেন, এমন অদ্ভুত একটা কাণ্ড তাঁরা ইতিমধ্যে ঘটিয়ে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা মানবজীবনের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করবে এই কথা বলাই বাহুল্য।

কারণ মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে যখন কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শোনা যায় তা মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিজ্ঞানও বার বার প্রমাণ করেছে সে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

কৃত্রিমভাবে মানবশরীরে বুদ্ধি বাড়ানোর বিষয় জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সম্পর্কে। জানা গেছে, মস্তিষ্কের সামনের দিকে রয়েছে লেফট ডোরসোল্যাটারাল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। এটি আমাদের অধিকাংশ চিন্তাভাবনার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক সেই অংশে খুব মৃদু পরিমাণে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে সেই অংশের ক্ষমতাকে বাড়াতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেই সেই ব্যক্তিদের চিন্তাশক্তিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা গেছে। যা অভাবনীয়।

এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে অন্যতম গবেষক ড. ক্যারোলিন ডি বের্নার্ডি লাফট জানান, কোনও সমস্যায় পড়লে আমরা সেই সমস্যা থেকেই সমাধানের পথ খুঁজি। ডিএলপিএফসির দ্বারাই আমরা সাধারণত সেটা করে থাকি। কিন্তু মস্তিষ্কেও প্রতিনিয়ত নানান মজার ঘটনা ঘটে চলেছে। যদি কোনও সমস্যা নতুন হয় সেক্ষেত্রে মস্তিষ্কে তৈরি হয় নানা ধরনের সমস্যা। তার কারণ, সমস্যা জানা থাকলে তার সমাধানের পথও আমাদের জানা থাকে, আর অজানা সমস্যা হলে তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াতে হয়। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। কারণ সমস্যা নতুন হলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ফলে সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে যায়। তাই বিজ্ঞানীদের মতে পূর্ব অভিজ্ঞতা সমস্ত সৃজনশীলতাকে আটকে দেয়। এই অবস্থায় যদি মস্তিষ্কের ওই অংশটিকে সাময়িক ভাবে দমন করে রাখা যায়, তা হলে মানুষ নতুন করে ভাবতে পারবে।

সেই দমনের কাজটাই করছে এই মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ। এখনও পর্যন্ত ষাটজনের ওপর এই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে তারা বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। যা বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞান না জানি আমাদের আরও কত কিছুই উপহার দেবে। তার সঠিক এবং উপযুক্ত ব্যবহার তো আমাদেরই করতে হবে তাই না!

জেনারেল নলেজ

চিনের আশ্চর্য কিছু কথা

চিন সম্পর্কে মানুষের জানার বেশ একটা আগ্রহ রয়েছে। সেখানকার ভাষা থেকে মানুষের শারীরিক গঠন, খাওয়াদাওয়া সবই বেশ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। এর সঙ্গে আকর্ষণ রয়েছে চিনের প্রাচীর সম্পর্কেও। যেটি ইট, পাথর, কাঠ ও অন্যান্য পদার্থ দিয়ে নির্মিত। চিনের বিশাল প্রাচীরটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণকারীদের দূরে রাখা এবং সামরিক অনুপ্রবেশকারীদের আটকানো। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত কারণেও চিন অনেক এগিয়ে আছে। তবে এই সমস্ত কিছু ছাড়াও চিন সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য আছে যা শুধু মজার নয় রীতিমতো আশ্চর্যের।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে প্রদর্শন করা

চিনের কয়েদিদের জন্যও আজব নিয়ম চালু আছে। এখানকার জেলখানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ভ্রাম্যমান গাড়িতে করে ঘোরানো হয়। এর পিছনে কারণ হল, এতে

কতজন আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে সেই বিষয়ে জনগণ জানতে পারবে। তবে অনেকের ধারণা, সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের সঠিক সংখ্যা জানানোর জন্য এটি একটি লোকদেখানো ব্যবস্থা। কারণ তাঁরা যতজন আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন তার থেকে কম সংখ্যক প্রদর্শন করেন।

হিউম্যান রাইটসের তথ্য অনুসারে, চিনে প্রতি বছর হাজারেরও বেশি লোককে মৃত্যুদণ্ডের মতো সাজা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে মাদক চোরাচালানকারী, কোনও কিছুতে ভেজাল দেওয়া বা দুর্নীতি করলেও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

আগে চিনে ফায়ারিং স্কোয়াড এর মাধ্যমে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও এখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বিষাক্ত ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়। চিনের সৈনিক হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে বড় সৈন্যবাহিনী। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেটের পরই চিনের সেনাদের বাজেটের স্থান। এর পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার!

চিনের সৈনিকদের অদ্ভুত নিয়ম আছে। অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি হল প্রশিক্ষণের সময় নতুন সৈনিকদের কলারে পিন লাগিয়ে দেওয়া। এতে তাদের ঘাড় ঘোরানোর সুযোগ থাকে না। এর পাশাপাশি চিনা সৈনিকরা কুকুর ছাড়াও বানর, হাঁস এবং পায়রাকেও প্রশিক্ষিত করে তোলে। এখনও পর্যন্ত তারা ১০ হাজারের বেশি পায়রাকে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যাতে আধুনিক প্রযুক্তি কোনও কারণে ব্যর্থ হলে এগুলি ব্যবহার করা যায়।

দূষণে ভরা বেজিং

যে দেশ এতটা উন্নত সেই দেশ দূষণে ভরা। চিনের পরিবেশ ঠিক কতটা দূষণ ভরা তা শুনলে চমকানো ছাড়া উপায় নেই। চিনের রাজধানী বেজিং এতটাই দূষিত যে, সারাদিন ২১টি সিগারেট যে পরিমাণ বায়ু দূষণ করে ঠিক সেই পরিমাণ দূষণ ছড়াচ্ছে বাতাসে। গ্রেট চায়নার তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, চিনের দূষণ মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হল চিনের ৯০ শতাংশ জল বিষাক্ত! টিভি বা ছবিতে লক্ষ করলে দেখা যায় চিনের বাসিন্দারা অনেকেই মুখে মাস্ক পরে রয়েছেন। এর কারণ

ওই স্থানের আবহাওয়ায় দূষণের পরিমাণ অনেকটাই বেশি।

গুহায় মানুষ

বর্তমান সময়েও চিনের সানজি প্রদেশের ইউনানে প্রায় ৪ কোটি লোক গুহায় বাস করে। ভাবা যায়! যে সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা থেকেও বেশি। এগুলোকে কৃষকের গুহা বা চিনা ভাষায় ইয়াওডঙ্গ বলে। আরও একটি অবাক করার মতো বিষয় হল গুহায় গরমে ঠান্ডা এবং ঠান্ডার সময় গরম লাগে। প্রায় ১৮ হাজার বছর পূর্বে ইয়োলো নদী থেকে পাহাড় এবং প্রাকৃতিক গুহা তৈরি হয়েছিল। ৪ হাজার বছর আগে মানুষ থাকার ব্যবস্থা করার জন্য নিজেরাই গুহা তৈরি করতে থাকে। তবে গুহাগুলি বেশ উন্নত মানের। এখানে বিদ্যুৎ ও প্লাম্বিংয়েরও সুবিধা রয়েছে। তবে গুহার ভিতর এই সমস্ত ব্যবস্থা করতে গিয়ে তারা অনেকগুলো প্রাকৃতিক গুহা নষ্টও করে ফেলেছে।

মাংস উৎসব

চিনের মানুষ বলতে গেলে সর্বভূক। চিনের গুয়াংজি প্রদেশের ইউলিন শহরে প্রতি বছর জুন মাসে কুকুরের মাংস উৎসব পালিত হয়। এতে আনুমানিক ১০-২০ মিলিয়ন কুকুর হত্যা করা হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিডিও গেমসের প্রতি আকর্ষণ কমাতে চিন সরকারের পক্ষ থেকে গেমস দূরীকরণ নিরাময় কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এখানে বাচ্চাদেরকে শরীরচর্চার শিক্ষা প্রদান করা হয় যাতে তারা গেমস আসক্তি থেকে সরে আসতে পারে।

কুকুর দিয়ে বাঘ

পোষা কুকুরকে রং করে বাঘ, পাণ্ডা এবং জেব্রা বানানো চিনের একটি বিশেষ ট্রেন্ড বলা যায়। ২০১৩ সালে একটি রং করা কুকুর চিড়িয়াখানায় ঢুকে গেলে অনেকেই তাকে বাঘ ভেবে ভুল করেছিল।

দীর্ঘ যানজট

জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে চিনে যানবাহনের সংখ্যাও অনেক বেশি। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বেইজিং-তিব্বত হাইওয়েতে সবচেয়ে লম্বা যানজটের মতো ঘটনা ঘটেছিল। জানা যায়, ৯৯ কিলোমিটারের একটি জট দশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। জট খোলার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আর পাঁচ দিন সময় লেগে গিয়েছিল। তবে এখানকার একটি ভালো দিক হল, চিন বর্তমানে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করেছে। যাতে পথচারীরা চলার পথে ফোন ব্যবহার করার জন্য দুর্ঘটনার মধ্যে না পড়েন।

বছরে কমপক্ষে ৭০টি

দিনদিন চিনে জনসংখ্যা বাড়ার কারণে কয়েক বছর আগে নির্মাণকাজ দ্রুত বেড়ে যায়। চিনে ২০১১-২০১৩ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ সিমেন্টের ব্যবহার হয়, তা নাকি আমেরিকায় পুরো বিশ শতকেও হয়নি! সে সময় গড়ে প্রতি পাঁচদিনে একটি আকাশচুম্বী দালান তোলা হত। বছরে এই সংখ্যা হত কমপক্ষে ৭০টি! চিনে ১৫টি মেগাসিটি রয়েছে এবং প্রতিটি মেগাসিটিতে ১০ মিলিয়ন লোক বাস করে। এত জনসংখ্যার মধ্যেও আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে সেখানে এখনও ৬৪ মিলিয়ন ঘর খালি রয়েছে।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

এডু টিপস

পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব?

মনোযোগের ব্যাপারটা বেশ মজার। আবার কঠিনও। কারওর সহজেই হয়। আবার কেউ সাতকুল খুঁজে মনোযোগ কী জিনিস বুঝে পায় না। অবাক হয়ে ভাবে এমন জিনিস আদপেও হয় তো? এখন অনেক কোচিং সেন্টার খুলছে, যারা দাবি করে— 'এখানে অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।' তাহলে অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী বলে কি বিশেষ কোনও গোষ্ঠী আছে? না, আসলে তা নয়। মনোযোগ বা মেন্টাল এনার্জি প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে। ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছেলেটা হয়তো সারাদিন ক্রিকেট নিয়েই থাকে বা টিভি দেখে, সে যখন টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখে বা তার পছন্দের কোনও অনুষ্ঠান দেখে, তখন সে সেটা একমনেই করে। তখন সে কী মগ্ন আর মনোযোগী। আবার পরীক্ষার আগে যখন চার মাসের পড়া করতে হবে এক সপ্তাহে, তখন যে কেউ কি গভীর আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ মূল বিষয়টি হচ্ছে আসলে যে ভিডিও-গেমপ্রেমী গেমকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, পড়াশোনাকে ততটা দিচ্ছে না। কিন্তু পরীক্ষার আগের রাতে যখন ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে পড়া, তখন ঠিকই একমনে পড়তে পারছে।

আসল কথা তাই মনোযোগ বাড়াতে নিজের ইচ্ছেশক্তিকে বাড়াতে হবে। আর তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে চাইলে কখনও তাড়াতাড়ি হয় না। কারণ যে কাজ তাড়াহুড়ো করে করতে যাবে সেই কাজেই দেরি হবে। অতএব ধীরে ধীরে মুখস্থ করতে হবে। পড়া বা যে কোনও কাজ মনোযোগের সঙ্গে করতে হলে ধৈর্যও বাড়াতে হবে। ফুটবল, ক্রিকেট বা ভিডিও গেম খেলা বা অন্য বিনোদনমূলক কাজে যে আগ্রহ রয়েছে আস্তে আস্তে পড়াশোনায় সেই আগ্রহটা তৈরি করতে হবে, তাহলেই তাড়াতাড়ি মনোযোগ ফিরবে। তাড়াতাড়ি পড়া তৈরি হবে।

নিয়মিত মেডিটেশন করলেও উপকার হয়। সেইসঙ্গে মনোযোগ বাড়ানোর কিছু সহজ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনোযোগের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আগ্রহ। পড়তে বসার আগে একটু চিন্তা করো—কী পড়বে, কেন পড়বে, কতক্ষণ ধরে পড়বে। প্রত্যেকবার পড়ার আগে কিছু টার্গেট ঠিক করে নাও। যেমন, এত পৃষ্ঠা বা এতগুলো অনুশীলনী। দু-নম্বর হল, বিষয়ের বৈচিত্র রাখাটা জরুরি। নিত্যনতুন পড়ার কৌশল চিন্তা করো।

এনার্জি লেভেলের সঙ্গে আগ্রহের একটা সম্পর্ক আছে। এনার্জি যত বেশি, মনোযোগ নিবদ্ধ করার ক্ষমতা তত বেশি হয়। আর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর দিনের প্রথমভাগেই এনার্জি বেশি থাকে। তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে পড়াটা দিনে এক ঘণ্টায় পড়তে পারছে সেই একই পড়া পড়তে রাতে দেড় ঘণ্টা লাগছে। তাই কঠিন, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে বিষয়গুলো সকালের দিকেই পড়ুন। পছন্দের বিষয়গুলো পড়ুন পরের দিকে। তবে যদি উলটোটা হয়, অর্থাৎ রাতে পড়তে যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, তাহলে সেভাবেই রুটিন সাজানো উচিত।

আরেকটা কাজ করা যেতে পারে, একটানা না পড়ে বিরতি দিয়ে পড়া। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত একটানা ৫০ মিনিটের বেশি একজন মানুষ মনোযোগ দিতে পারে না। তাই একটানা মনোযোগের জন্যে মনের ওপর বল প্রয়োগ না করে প্রতি ৫০ মিনিট পড়ার পর পাঁচ মিনিটের একটা ছোট্ট বিরতি নিলে লাভ হয়। কিন্তু এ বিরতির সময় টিভি, মোবাইল বা কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত না হওয়াই ভালো কারণ এরা হয়তো পাঁচ মিনিটের নামে দু-ঘণ্টা নিয়ে নিতে পারে।

মনোযোগের জন্যে কোন ভঙ্গিতে পড়তে বসছ সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। সোজা হয়ে আরামে বসতে হবে। অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বন্ধ করো। চেয়ারে এমনভাবে বসো যাতে পা মেঝেতে লেগে থাকে। টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে বসলে আরাম হবে। চোখ আর টেবিলের মধ্যেকার দূরত্ব নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা উচিত।

পড়তে পড়তে মন যখন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন জোর করে তখন বইয়ের দিকে তাকিয়ে না থেকে দাঁড়িয়ে পড়ো। তবে ঘর ছেড়ে যেও না। কয়েকবার এ অভ্যাস করলেই দেখবে আর অন্যমনস্ক হচ্ছ না।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসতে হবে এবং পড়তে বসার আগে কোনও অসমাপ্ত কাজে হাত দেওয়া যাবে না বা সেটার কথা মনে এলেও পাত্তা না দিয়ে থাকতে হবে। চিন্তাগুলোকে বরং একটা কাগজে লিখে রাখো। আর সবশেষে, যদি টার্গেটমতো পড়া ঠিকঠাক করতে পারো, তাহলে নিজেই নিজেকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে, তা যত ছোটই হোক।

যুগশঙ্খ SUPPLI team

উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, বিপাশা চক্রবর্তী**

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

সমাস

সমাসের প্রকারভেদ: আমরা আলোচনা করছিলাম সমাস নিয়ে। আজ আমরা সমাসের ভাগগুলি সম্পর্কে জানব। সমাস সাধারণত ছয় প্রকারের। দ্বন্দ্ব সমাস, তৎপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, দ্বিগু সমাস, বহুব্রীহি সমাস এবং অব্যয়ীভাব সমাস।

কর্মধারয় সমাস :

'বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো'—এখানে 'বুড়ো' আর 'মানুষ' পদদুটি মিলে হয়েছে 'বুড়োমানুষ'। পূর্বপদ 'বুড়ো' বিশেষণ এবং পরপদ 'মানুষ' বিশেষ্য পদ। এখানে পর পদ 'মানুষ' পদটির অর্থ প্রধান। বুড়ো যে মানুষ= বুড়ো মানুষ- কর্মধারয় সমাস।

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ও বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ ও বিশেষণ আর পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বলে কর্মধারয় সমাস। কর্মধারয় সমাসে উভয় পদে একই বিভক্তি হয়।

কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকার। যথা,সাধারণ কর্মধারয়, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়।

কর্মধারয় সমাসের সাধারণ লক্ষণ :

১) পূর্বপদ ও পরপদে শূন্য বিভক্তি হবে।

২) সাধারণত পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য। পরপদের অর্থ প্রধান হয়।

৩) একার্থ বোধক হলে উভয় পদ বিশেষ্য হতে পারে। যেমন- যিনি মা তিনি গঙ্গা= মাগঙ্গা এখানে মা ও গঙ্গা একই ব্যক্তি)।

৪) পূর্বপদটি বিশেষণ ভাবাপন্ন হলে উভয় পদই বিশেষ্য হতে পারে। যেমন, ছেলে যে মানুষ= ছেলেমানুষ (এখানে পূর্বপদ 'ছেলে' বিশেষ্য হলেও বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়েছে)।

১)সাধারণ কর্মধারয়: সাধারণ কর্মধারয় সমাসে কর্মধারয় সমাসের সাধারণ লক্ষণগুলি সব উপস্থিত থাকে। যেমন, বড় যে দাদা= বড়দা।

২) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদ সমস্ত পদে লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, সিঁদুর (রাখবার) কৌটা= সিঁদুরকৌটা। হাতে (পরবার) ঘড়ি= হাতঘড়ি।

৩) উপমান কর্মধারয় সমাস: উপমানবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ পদের যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে বলে উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমন, তুষারের ন্যায় ধবল= তুষারধবল। জলদের ন্যায় গম্ভীর= জলদগম্ভীর।

৪) উপমিত কর্মধারয় সমাস: যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদে উপমেয় এবং পরপদে উপমান থাকে এবং সাধারণ ধর্মের কোনও উল্লেখ থাকে না তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, পুরুষ সিংহের ন্যায়= পুরুষসিংহ। চরণ কমলের ন্যায়= চরণকমল।

৫) রূপক কর্মধারয় সমাস: যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ উপমেয়, পরপদ উপমান এবং উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য না বুঝিয়ে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: শোকরূপ সাগর= শোকসাগর। ভব রূপ নদী= ভবনদী।

তৎপুরুষ সমাস: যে সমাসে পূর্বপদের কারক বোধক বা সম্বন্ধ বোধক বিভক্তি বা অনুসর্গ লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয়, তাকে বলে তৎপুরুষ সমাস। সংস্কৃতে পূর্বপদের নাম অনুসারে তৎপুরুষ সমাসকে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

কারক ভেদে তৎপুরুষ সমাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়- কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, নিমিত্ত তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ, সম্বন্ধ তৎপুরুষ, অধিকরণ তৎপুরুষ। এছাড়াও আছে না-তৎপুরুষ, ব্যাপ্তি তৎপুরুষ, ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ, উপসর্গ তৎপুরুষ এবং উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

১) কর্ম তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পায় তাকে বলে কর্ম তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসের পূর্বপদে কে, রে, এ বিভক্তি বা কোনও অনুসর্গ থাকে। যেমন: জলকে খাওয়া= জলখাওয়া।

২) করণ তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পায় তাকে করণ তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসের পূর্বপদে দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, হীন, রহিত প্রভৃতি অনুসর্গ থাকে। যেমন: মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

৩) নিমিত্ত তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি লোপ পায় বা অনুসর্গ লোপ পায় তাকে বলে নিমিত্ত তৎপুরুষ। এই সমাসে পূর্বপদে কে, রে, এ বিভক্তি অথবা চতুর্থী বিভক্তি স্থানে 'জন্য' উদ্দেশ্য 'নিমিত্ত' প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত থাকে। যেমন: ছাত্রদের নিমিত্ত আবাস: ছাত্রাবাস।

৪) অপাদান তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পায় বা অনুসর্গ লোপ পায় তাকে বলে অপাদান তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসে পূর্বপদে হইতে, থেকে প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত থাকে। যেমন: আদি হইতে অন্ত= আদ্যন্ত।

৫) সম্বন্ধ তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে সম্বন্ধ অর্থক ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পায় তাকে সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: নরের অধিপ: নরাধিপ।

৬) অধিকরণ তৎপুরুষ: পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে অধিকরণ তৎপুরুষ বলে। এই সমাসের পূর্বপদে এ, তে, এতে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন: বনে বাস= বনবাস। সভায় আসীন= সভাসীন।

৭) উপপদ তৎপুরুষ: উপপদ কথাটির মূল অর্থ নিকটবর্তী পদ। যে পদ কৃদন্ত শব্দের ঠিক পূর্বে বসে তাকে উপপদ বলে। উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন: গৃহে থাকে যে= গৃহস্থ।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

এরকম হলে অভিভাবকদের সন্তানের প্রতি বেশি করে দেওয়া প্রয়োজন। দরকার হলে আমরা অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে থাকি। এছাড়াও বিদ্যালয়ে অনেক পড়ুয়াদের দেখা যায় যারা সেলাই, আঁকা, হাতের কাজ এইসব কাজে বেশি পারদর্শী। তাই সেই সমস্ত পড়ুয়াদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। এতে ভবিষ্যতে তারা নিজের উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে সক্ষম হবে।

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ **'আমার স্কুল'** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

শিলা ও মাটি

আজ আমরা শিলা আর মাটি নিয়ে জানব। পৃথিবীটা ঢাকা আছে শিলা আর মাটি দিয়ে। পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণটা আসলে শিলা দিয়ে তৈরি। যাকে পাথরের মতো লাগে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত একটা যৌগিক পদার্থই হল শিলা। নানা প্রাকৃতিক উপায়ে যেমন সূর্যের তাপ, বৃষ্টির আঘাত, বাতাসের ধাক্কা বা স্রোতের দ্বারা শিলা ভেঙ্গে কখনও ওইখানেই পরে থাকে আবার কখনও বা জল বা বাতাসের সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে যায়। এক নাগাড়ে ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় হয়ে যাওয়া শিলার স্তর বিন্যাস হয়। একেই রোগোলিথ বলে। সবার শেষে রেগোলিথ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় মাটি তৈরি হয়। শিলা তার গঠন আর বৈশিষ্ট্যের কারণে নানা রকমের হয়। শিলাকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল:

আগ্নেয়শিলা: জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক আগুনের গোলা। আস্তে আস্তে ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে তৈরি হয় আগ্নেয়শিলা। গ্রানাইট, ব্যাসল্ট এই ধরনের শিলা। আগ্নেয় শিলা খুব কঠিন, সহজে ভাঙে না।

পাললিক শিলা: বহু বছর ধরে আগ্নেয়শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষয় হয়ে নুড়ি, কাঁকর, বালিতে পরিণত হয়। পরে এগুলো সমুদ্রের নীচে স্তরে স্তরে জমা হয়। বহু বছর পরে শক্ত হয়ে তৈরি হয় পাললিক শিলা। বেলেপাথর, কাদাপাথর হল পাললিক শিলা। পাললিক শিলা হল নরম ও ভঙ্গুর। এই দুই শিলা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। সিমেন্ট, ইস্পাত কারখানায় চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

রূপান্তরিত শিলা: আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূগর্ভের তাপে ও ভূপৃষ্ঠের চাপে অনেক সময় বদলে গিয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। এই শিলা সহজে ভাঙে না। বিখ্যাত তাজমহল রূপান্তরিত শিলা, মার্বেল দিয়ে তৈরি।

এবার আমরা জানব মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকগুলোকে। আগেই আমরা জেনেছি শিলা নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মাটিতে পরিবর্তিত হয়। এই মাটি সৃষ্টির পথে বেশ কিছু বিষয় আছে যারা মাটি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এদেরকেই আমরা মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক বলি। নীচে আমরা এদের সম্পর্কে জানব।

শিলা: মাটি কেমন হবে তা নির্ভর করে শিলার প্রকৃতির উপর। মাটির গুণাগুণ, কার্যকারিতা, কাঠিন্য ইত্যাদি নির্ভর করে গঠনমূলক শিলার উপর। তবে জলবায়ু, উদ্ভিদও মাটি তৈরিকে প্রভাবিত করে।

জলবায়ু: জলবায়ু মাটি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। উষ্ণ বৃষ্টিবহুল জলবায়ুতে মাটি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। আবার শীতল ও শুষ্ক অঞ্চলে মাটি তৈরি হতে সময় নেয়। তাই উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে মাটির গভীরতা বেশি হয়।

প্রকৃতি: ভূমির প্রকৃতি মাটি তৈরি হওয়াকে প্রভাবিত করে। ভূমির খাড়া ঢালে মাটি তৈরির সুযোগ কম। কারণ শিলাচূর্ণ বা অন্যান্য গঠনমূলক পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে গড়াতে থাকে এবং জমতে বাধা পায়। আবার ভূমির ঢাল যেখানে কম, সেখানে ধীরে ধীরে মাটির স্তর তৈরি হয়।

জীব জগৎ: জীবিত ও মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অংশ মাটিতে খুব কমই থাকে। কিন্তু পিঁপড়ে, কেঁচো, সাপ মাটিকে আলগা করে। ফলে জল ও বাতাস মাটিতে প্রবেশ করে। নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী মাটির পুষ্টি যোগায়।

সময়: মাটি তৈরিতে সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটি একদিনে হয় না। কখনও কখনও লক্ষ লক্ষ বছরও লাগে।

মাটির দানা: মাটির দানা তৈরি হয় তাতে উপস্থিত বালি, মাটি ও অন্যান্য পদার্থের ভাগ অনুসারে। মাটির দানার মাপ বড় না ছোট তার উপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণি বিভাগ করা হয়। মাটির দানার উপর মাটির গুণাগুণ নির্ভর করে। যেমন বেলে মাটির দানা মোটা। তাতে বালির ভাগ বেশি। কাদা মাটির দানা সূক্ষ্ম। আবার দোঁয়াশ মাটিতে বালি আর কাদার পরিমাণ সমান সমান।

এছাড়া জল, বাতাস ও অন্য উপাদানও সঠিক মাত্রায় থাকে। তাই এই মাটিতে চাষের কাজ ভালো হয়।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: বিজ্ঞান

প্রতিবিম্ব

আজ আমরা আলোর এক কারসাজি, প্রতিবিম্ব সম্পর্কে জানব। আয়নায় আমরা যে দ্বিতীয় আমিকে দেখতে পাই তা-ই আমাদের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দু'টি কারণে তৈরি হয়, প্রতিফলন আর প্রতিসরণ। নিজের থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ আয়নায় বাধা পেয়ে সরাসরি আমাদের চোখে এসে প্রতিবিম্ব তৈরি করলে তখন সেই বস্তুকে আমরা তার নিজের অবস্থানেই দেখতে পাই। এই ঘটনাকে প্রতিফলন বলে। কখনও কখনও বস্তু থেকে আলোকরশ্মিগুলো সোজাসুজি আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় না। বাঁকা পথ অনুসরণ করে। এই ঘটনাকে প্রতিসরণ বলে। আলোকরশ্মি দু'টি ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যম দিয়ে যাওয়ার সময় যেমন, জল (ঘনতর), বাতাস (লঘুতর) বেঁকে যায়। তাই সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের চোখ অন্য কোনও স্থানে বস্তুর প্রতিবিম্বকে দেখে। জল ভর্তি বালতির তলাটা তার আসল অবস্থান থেকে কিছুটা ওপরে দেখায়।

জেনে রাখো, কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় আবার কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না। যাদের পর্দায় ফেলা যায় তাদের সদবিম্ব, আর যাদের পর্দায় ফেলা যায় না তাদের অসদবিম্ব বলে। আবার কখনও আতস কাচের মধ্যে দিয়ে এক টুকরো কাগজে সূর্যরশ্মি ফেললে যে গোল চাকতির মতো দেখা যায় সেটি হল সূর্যের প্রতিবিম্ব। এটি সদবিম্ব কারণ এটি কাগজের উপর তৈরি হয়েছে। কাগজ এক্ষেত্রে পর্দা। তবে মনে রাখতে হবে পর্দার থেকে বস্তুর দূরত্ব বাড়লে বা কমলে বস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যেকার দূরত্ব তার দ্বিগুণ বাড়ে বা কমে। একটি সমতল আয়না শুধু একটি প্রতিবিম্বই গঠন করতে পারে। সেলুনে সামনে পিছনে দু'দিকেই আয়না বসানো থাকে। কারণ সেক্ষেত্রে পিছনের আয়নার প্রতিবিম্ব সামনের আয়নায় দেখা যায়। এতে আমরা আমাদের পিছনের জিনিস দেখতে পারি। আবার দু'টি আয়নাকে পরস্পরের সমান্তরাল করে একটু ব্যবধানে বসালে তাদের দ্বারা যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তার সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না।

প্রতিবিম্বকে কাজে লাগিয়ে একটি মজার জিনিস বানানো যায় সেটি হল পেরিস্কোপ। তিনটি একই মাপের পিচবোর্ড জুড়ে তাদের মধ্যে সমান ভাবে কাচ বসিয়ে এটি বানানো হয়। এবার কোনও কিছুর থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ পেরিস্কোপের বাক্সের ভিতর প্রবেশ করলে তা বারে বারে তিনটি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে এসে পৌঁছয়। আগেকার দিনে খেলার মাঠের বাইরের দর্শকেরা এই পেরিস্কোপ দিয়েই খেলা দেখতেন। এছাড়া সাবমেরিন, ট্যাংকেও এর ব্যবহার হয়। অনেকটা একইভাবে বানানো যায় ক্যালাইডোস্কোপ।

প্রতিসরণ এর সূত্র: প্রতিসরণের ক্ষেত্রে মাধ্যমের ভূমিকা অনেক। আলাদা ঘনত্বের কিন্তু দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মির প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক একই থাকে। আপতন কোণ বা প্রতিসরণ কোণের ওপর এই মান নির্ভর করে না। আলোক রশ্মি যখন শূন্যস্থান থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন ওই মাধ্যম-এর প্রতিসরাঙ্ককে মাধ্যম-এর পরম প্রতিসরাঙ্ক বলে।

আলোর প্রতিসরণ দু'টি নিয়ম মেনে চলে—

১) আপতিত রশ্মি ও দুই মাধ্যম-এর বিভেদ তলে আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব যে সমতলের ওপর থাকে প্রতিসৃত রশ্মিটিও সেই সমতলেই থাকবে।

২) প্রতিসরণের সময় রং ও মাধ্যম এক থাকলে প্রতিসরাঙ্কের মান এক থাকবে। আপতন কোণ বা প্রতিসরণ কোণের মান পালটালেও প্রতিসরাঙ্কের মান পালটায় না।

তবে এটা মাথায় রাখতে হবে আপাতন কোণের মান বড় হলে প্রতিসরণ কোণের মানও বাড়তে থাকবে। তখন প্রতিসৃত রশ্মিটি মাধ্যম দুটির বিভেদ তল ঘেঁষে চলে। আপাতন কোণের সেই মানকে মাধ্যম দু'টির সংকট কোণ বলে।

অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন: আপতন কোণের মান যদি মাধ্যম দু'টির সংকট কোণের চেয়ে বড় হয় তখন আলোকরশ্মি বিভেদ তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে, মানে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসৃত হতে পারে না। এটি হল অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন। যেমন, মরীচিকা। মরুভূমিতে দিনেরবেলায় বালি প্রচণ্ড গরম থাকে বলে নীচের দিকে বাতাস বেশি গরম হয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমের দিকে চলতে থাকে, এবং এর গতিপথ বারবার পরিবর্তন করে। ফলে প্রতিবিম্বের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে, এইভাবে মরীচিকা সৃষ্টি হয়। আবার শীতপ্রধান দেশে আকাশে বস্তুর ওলটানো প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই ঘটনাও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কারণে ঘটে।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

দুর্যোগ ও বিপর্যয়

ঘূর্ণিঝড়: প্রচণ্ড নিম্নচাপের ফলে যে প্রবল ঝড় হয় তাকেই ঘূর্ণিঝড় বলে। বায়ুমণ্ডলের কোনও অংশ হঠাৎ করে গরম হয়ে গেলে সেই অংশের বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এবার এই ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে আশেপাশের শীতল বায়ু এসে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ঘটায়। উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপে বায়ুঘড়ির কাঁটার উলটোদিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধের বায়ুঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রবেশ করে। জলীয়বাষ্প যুক্ত গরম সামুদ্রিক বায়ুতে এই ঝড় বেশি হয়। তাই পৃথিবীর বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড় উত্তর গোলার্ধে ৮°-২০" অক্ষাংশের মধ্যেই হয়। ভারতে এটা হয় ক্রান্তীয় সমুদ্রের উপকূলে। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০-২৪০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর প্রধান ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল হল— চিন সাগর (দক্ষিণ চিন, জাপান ও ফিলিপাইন), বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর (হ্যারিকেন), উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব অংশ ও উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া।

বন্যা: কোনও অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির ফলে তা সম্পূর্ণভাবে জলে ভরে গেলে তাকে বন্যা বলে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা আর থাকে না। ফলে অতিরিক্ত জল নদীর পাড় ছাপিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়। অঞ্চলবিশেষে বন্যার অনেক কারণ হয়। যেমন— ১) অতিবর্ষণ, ২) পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যাওয়া, ৩) বিশেষ ঝড়, ৪) নদীর ধারে বাঁধ বা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি, ৫) নদী উপত্যকায় ধস এবং ৬) অত্যধিক নীচু অঞ্চল ইত্যাদি। উত্তরাখণ্ডে হওয়া ভীষণ বন্যার মূল কারণ ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি।

ভারতের প্রধান বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলো হল— উত্তরের সমভূমি অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম নদী অববাহিকা, উপদ্বীপীয় অঞ্চল।

খরা: কোনও অঞ্চলের অবস্থান অনুযায়ী বছরের গড় বৃষ্টিপাতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। কোনও বছর যদি সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় ৭৫% বা তার থেকে কম হয় তাহলে সেখানে জলাভাব দেখা দেয় এবং মাটি শুকিয়ে গাছপালা, পশুপাখি সব মারা যেতে থাকে এই অবস্থাকেই বলে খরা। খরা খুব ধীর গতির প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

খরার প্রধান কারণগুলো হল— বৃষ্টিপাতের অভাব, আর্দ্র সামুদ্রিক বায়ুর বদলে শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ুর প্রবেশ ও কৃষিকাজ ও মানুষের বসতির বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদে ভূমিক্ষয় বেড়ে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস।

ধস: মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য পার্বত্য শিলা, মাটি বা কিছুটা জায়গা নীচের দিকে নেমে আসে, একেই বলে ধস। তুষার ধস এরই প্রমাণ। যে অঞ্চলে বৃষ্টি বা বরফ গলার পরিমাণ বেশি সেখানে ধসও বেশি হয়। তবে এটি প্রধানত পাহাড়ি অঞ্চলে হয়। ধসের মূল কারণগুলো হল— ঢালু অঞ্চলের শিলা বা মাটি জলধারায় ক্ষয় হয় তার ওপর বাড়ি, রাস্তা তৈরি, দুর্বল শিলা, ও অতিবর্ষণ।

ধস পাহাড়ি অঞ্চলে হলেও এর প্রভাব সমভূমিতেও দেখা যায় কারণ নদীর রাস্তা বন্ধ হয়, ভূমির ঢালও পরিবর্তিত হয়।

অগ্ন্যুৎপাত: মাটির ভিতরের ফুটন্ত তরল ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির মধ্যে দিয়ে যখন মাটির উপরে উঠে আসে তখন তাকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। ভূগর্ভে দুটি চলমান পাতের মধ্যে ধাক্কা লাগলে বা একটি আরেকটির উপর উঠে এলে অগ্ন্যুৎপাত হয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ অগ্ন্যুৎপাত সমুদ্রের তলায় হয়। বলা যায় divergent margin বা মহাসাগরীয় বা মহাদেশীয় পাতের প্রান্ত বরাবর এই অগ্ন্যুৎপাত হয়। এটি তিন প্রকার হয়— সক্রিয়, সুপ্ত ও মৃত।

হিমানী সম্প্রপাত: তুষারাবৃত অঞ্চলে সমানে তুষারপাতের ফলে তুষার মাটিতে জমতে থাকে। পরে তা অবলম্বনহীন হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে নীচে নেমে আসে। একেই বলে হিমানী সম্প্রপাত। এরা দুই রকমের হয়— একটি বরফের স্তর থেকে আরেকটি স্তর বিচ্যুত হলে তাকে ভূপৃষ্ঠীয়, আর মূল শিলা থেকে বরফের স্তর বিচ্যুত হলে তাকে পূর্ণ ও গভীর হিমানী সম্প্রপাত বলে।

তুষার ঝড়: ৫৬ কিমি বা তার বেশি বেগে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় যখন তুহিন ঝড় হয় তখন তাকে তুষার ঝড় বলে। এতে তুষারপাত হয় না, জমে থাকা তুষারই বাতাসে মিশে যায়।

দাবানল: বনেজঙ্গলে পাতায় পাতায় ঘষা লেগে যখন আগুন ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে দাবানল বলে। এর আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে যায় যে তা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। এর মূল কারণ বজ্রবিদ্যুৎ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূ-অভ্যন্তরীণ কয়লার দহন ও মানুষের লাগানো আগুন। দাবানল তিন প্রকার— ১) ভৌম আগুন: মাটির সঙ্গে মিশে থাকা গাছপালা দাহ্য ও বিয়োজিত হয়ে গেলে, এগুলো জ্বালানি হিসাবে আগুনের কাছে এলেই জ্বলে ওঠে। ২) ভূপৃষ্ঠীয় আগুন: শুকনো গাছ, পাতায় আগুন লেগে এই দাবানল সৃষ্টি হয়। এবং ৩) শীর্ষ আগুন: গাছের ওপরের দিকের অংশে আগুন লাগলে তা ছড়িয়ে পড়েও দাবানল হয়।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

আলোর প্রতিফলন

গোলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন

গোলীয় দর্পণ: কোনও প্রতিফলকতল কোনও গোলোকের অংশ হলে তাকে গোলীয় দর্পণ বলে। গোলীয় দর্পণ দু'প্রকারের— ১) অবতল দর্পণ এবং ২) উত্তল দর্পণ।

গোলীয় দর্পণটির ভিতরের পৃষ্ঠ প্রতিফলকতল হিসাবে কাজ করলে দর্পণটিকে অবতল দর্পণ বলা হয়। এবং বাইরের পৃষ্ঠ প্রতিফলকতল হিসাবে কাজ করলে দর্পণটিকে উত্তল দর্পণ বলা হয়।

মেরু বা মধ্যবিন্দু: গোলীয় দর্পণের প্রতিফলকতলের মধ্যবিন্দুকে ওই দর্পণের মেরু বলা হয়।

বক্রতাকেন্দ্র: গোলীয় দর্পণটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রবিন্দুকে বক্রতাকেন্দ্র বলে। অবতল দর্পণের বক্রতাকেন্দ্র প্রতিফলকতলের সামনে থাকে, কিন্তু উত্তল দর্পণের বক্রতাকেন্দ্র প্রতিফলকতলের পিছনে থাকে।

বক্রতাব্যাসার্ধ: গোলীয় দর্পণটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে দর্পণটির বক্রতাব্যাসার্ধ বলে।

প্রধান অক্ষ: গোলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দু ও বক্রতাকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত সরলরেখাটিকে দর্পণটির প্রধান অক্ষ বলা হয়।

উপাক্ষীয় রশ্মি: যে সকল রশ্মি গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সঙ্গে ক্ষুদ্র কোণে এবং দর্পণের মেরুর খুব নিকটবর্তী অঞ্চলে আপতিত হয় তাদের উপাক্ষীয় রশ্মি বলা হয়।

প্রান্তিক রশ্মি: যে সকল রশ্মি গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সঙ্গে বড় কোণে এবং দর্পণের মেরু থেকে দূরে অর্থাৎ দর্পণের প্রান্তে আপতিত হয় তাদের প্রান্তিক রশ্মি বলা হয়।

গোলীয় দর্পণে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছের প্রতিফলন ও ফোকাস: কোনও সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসে গোলীয় দর্পণে আপতিত হলে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মিগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। ওই নির্দিষ্ট বিন্দুটি প্রধান অক্ষের ওপরে থাকে। এই বিন্দুটিকে গোলীয় দর্পণের মুখ্য ফোকাস বা সংক্ষেপে ফোকাস বলা হয়।

অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

গোলীয় দর্পণে অপসারী ও অভিসারী রশ্মিগুচ্ছের প্রতিফলন: আলোকরশ্মির প্রত্যাগমনের নিয়মানুসারে—

১) অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকাস থেকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ ওই দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর প্রধান অক্ষের সমান্তরালে অগ্রসর হয়।

২) উত্তল দর্পণের মুখ্য ফোকাসের দিকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ ওই দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হয়।

ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য: দর্পণের মেরু বা মধ্যবিন্দু থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলা হয়।

রশ্মিচিত্রের সাহায্যে গোলীয় দর্পণ দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠনের কৌশল:

গোলীয় দর্পণের সামনে বস্তু রাখলে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করতে ফোকাস ও বক্রতাকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য কাজে লাগানো হয়। তা হল—

১) ফোকাস বিন্দুর মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনও রশ্মি: এই রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পর প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে চলে যাবে।

২) বক্রতাকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনও রশ্মি: এই রশ্মি যে পথে আপতিত হয় প্রতিফলিত হওয়ার পর সেই একই পথে ফিরে যাবে। কারণ বক্রতাকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে দর্পণে আপতিত হওয়ার অর্থ হল দর্পণে লম্বভাবে আপতিত হওয়া।

৩) প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনও রশ্মি: এই রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পর ফোকাস বিন্দুর মধ্য দিয়ে যাবে।

গোলীয় দর্পণের ব্যবহার:

১) দাড়ি কামানোর সময় অবতল দর্পণ ব্যবহার করলে দাড়ি কামানো সহজতর হয়। কারণ এই দর্পণের মেরু ও ফোকাসের মাঝে কোনও বস্তু রাখলে বস্তুর একটি অসদ সমশীর্ষ এবং বস্তুর চেয়ে আকারে বড় প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। তাই দাড়ি কামানোর সময় মুখমণ্ডলকে স্পষ্ট করে দেখার জন্য এই রকম আয়না ব্যবহার করা হয়।

২) গলা, নাক, দাঁত ইত্যাদি পরীক্ষার সময় অল্প জায়গায় সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ফোকাস করার জন্য চিকিৎসকেরা অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন। দন্ত চিকিৎসকগণ একটি বিশেষ ধরনের অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন দাঁতের পিছনদিক দেখার জন্য।

৩) রাস্তায় আলোর প্রতিফলক হিসাবে উত্তল দর্পণের ব্যবহার করা হয়। কারণ এই প্রতিফলক বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে আলোকে ছড়িয়ে দেয়।

৪) মোটরগাড়ি বা স্কুটার চালানোর সময় পিছনদিক থেকে কোনও গাড়ি আসছে কি না দেখার খুব দরকার, অথচ গাড়ি চালানোর সময় চালককে সর্বদা সামনের দিকে তাকাতে হয়, কারণ গাড়ি চালাতে চালাতে পিছনদিকে তাকালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য চালকের সামনে ভিউফাইন্ডার হিসাবে একটা উত্তল দর্পণ রাখা থাকে। এই দর্পণে সবসময় বস্তুর চেয়ে আকারে ছোট, সমশীর্ষ অসদবিম্ব গঠিত হয়। দর্পণটি ছোট হলেও উত্তল দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় বলে পিছনের অনেকটা জায়গা ওই ছোট দর্পণের ভিতর দিয়ে চালকের চোখে ধরা পড়ে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

বাংলা সিনেমা

ভারতে বাংলা সিনেমা বলতে মূলত টলিউডের সিনেমাকে বোঝায়। আবার টলিউড বলতে কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকাভিত্তিক সিনেমা শিল্পকে বোঝায়। বাংলা সিনেমার বক্স অফিস বা সিনেমাগুলির বাজেট দেশের অন্যান্য সিনেমা শিল্প, যেমন বলিউড (মুম্বইভিত্তিক), তামিল, তেলেগু, মালায়লম-এর তুলনায় অনেক কম হলেও বাংলা সিনেমা আন্তর্জাতিক সমালোচক বা দর্শকের কাছে চিরকাল সমান্তরাল প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা পেয়ে এসেছে। এজন্যই বাংলা সিনেমা, তার পরিচালক ও কলাকুশলীরা অনেকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কারের মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ও সমাদৃত হয়েছেন। আধুনিক বাংলা সিনেমাও আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত সিনেমার নিয়মকে কাব্যিক, তাত্ত্বিক থেকে মূর্ত ও রোমান্টিক কল্পনার দ্বারা পুনরায় উদ্ভাবন করার জন্য।

তাই আজকে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের চর্চার বিষয় হল বাংলা সিনেমার ইতিহাস।

১) প্রথম বাংলা সিনেমা কত সালে তৈরি হয়েছিল?

আজ পর্যন্ত ৬৪টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে বাংলা সিনেমা ২২ বার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। এগুলি হল—

সাল	সিনেমা	পরিচালক
১৯৫৫	পথের পাঁচালি	সত্যজিৎ রায়
১৯৫৬	কাবুলিওয়ালা	তপন সিনহা
১৯৫৮	সাগর সঙ্গমে	দেবকি বোস
১৯৫৯	অপুর সংসার	সত্যজিৎ রায়
১৯৬১	ভগিনী নিবেদিতা	বিজয় বোস
১৯৬২	দাদাঠাকুর	সুধীর মুখার্জি
১৯৬৪	চারুলতা	সত্যজিৎ রায়
১৯৬৭	হাটে বাজারে	তপন সিনহা
১৯৬৮	গুপি গাইন বাঘা বাইন	সত্যজিৎ রায়
১৯৭১	সীমাবদ্ধ	সত্যজিৎ রায়
১৯৭৪	কোরাস	মৃণাল সেন
১৯৮০	আকালের সন্ধানে	মৃণাল সেন
১৯৮১	দখল	গৌতম ঘোষ
১৯৮২	চোখ	উৎপলেন্দু চক্রবর্তী
১৯৮৯	বাঘ বাহাদুর	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
১৯৯১	আগন্তুক	সত্যজিৎ রায়
১৯৯৩	চরাচর	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
১৯৯৪	উনিশে এপ্রিল	ঋতুপর্ণ ঘোষ
১৯৯৬	লাল দরজা	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
২০০২	মন্দ মেয়ের উপাখ্যান	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
২০০৫	কালপুরুষ	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
২০০৮	অন্তহীন	অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি

এতকাল ধারণা ছিল 'বিল্বমঙ্গল'-ই প্রথম বাংলা সিনেমা। কিন্তু হালে জানা গেছে প্রথম বাংলা কাহিনিচিত্র 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র' যা মুক্তি পায় ১৯১৭ সালের ২৪ মার্চ। এই সিনেমার টাইটেল কার্ড বাংলায় লেখা ছিল। সেই অর্থে এই বছরই বাংলা সিনেমার শতবার্ষিকী বছর।

২) প্রথম শব্দ সহ বাংলা সিনেমা কোনটি?

প্রথম শব্দ সহযোগে বাংলা সিনেমা হল ১৯৩১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মদন থিয়েটার প্রোডাকশনের অমর রায়চৌধুরীর পরিচালিত 'জামাইষষ্ঠী' সিনেমাটি। এই সিনেমাটি কলকাতার ক্রাউন সিনেমা হলে ১১ এপ্রিল, ১৯৩১ তারিখে মুক্তি পায়। এই সিনেমাটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা হিসাবে মুক্তি পায়।

৩) প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শব্দসহ বাংলা সিনেমা কোনটি?

প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শব্দ সহ বাংলা সিনেমা হল ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে কলকাতার চিত্রা সিনেমা হলে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেনাপাওনা'।

৪) কলকাতার বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে টলিউড বলে, এই নামটি প্রথম কে করেন?

টলিউড নামটি হলিউড শব্দটি থেকে অনুপ্রাণিত। ১৯৩২ সালের মার্চে 'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার উইলফোর্ড ই ডেমিং এই ইন্ডাস্ট্রিকে টলিউড নামে অভিহিত করেন। উইলফোর্ড ই ডেমিং সেই সময় প্রথম শব্দসহ ভারতীয় চলচ্চিত্র বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

৫) বাংলা সিনেমার ভিত্তি কার হাতে রচিত হয়েছিল?

বাংলা সিনেমার ইতিহাস শুরু হয়েছিল সেই ১৯২০ সাল নাগাদ যখন কলকাতার থিয়েটারগুলিতে বায়স্কোপ দেখানো হত। এর এক দশকের মধ্যে এই শিল্পের প্রথম ভিত্তি রচনা করেন ভিক্টোরিয়ান যুগের চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ হিরালাল সেন। তিনি প্রথম রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার নানা থিয়েটারে মঞ্চস্থ জনপ্রিয় থিয়েটারের দৃশ্যগুলির সিনেমারূপ দিতেন।

৬) কোন বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা পরিচালক প্রথম সাম্মানিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার পান?

১৯৯২ সালে চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর বিরল আধিপত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ও পৃথিবীর চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকদের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তারকারী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সত্যজিত রায়কে সাম্মানিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

৭) কোন বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা পরিচালককে ভারত ও ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়?

সত্যজিৎ রায়কে ভারত ও ফ্রান্সের সর্বোচ্চ

নাগরিক সম্মান যথাক্রমে 'ভারতরত্ন' ও 'লিজিয়ন অব অনার' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

৮) কোন বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা পরিচালককে ফ্রান্সের 'French distinction of Commander of the Order of Arts and Letters' ও রাশিয়ার 'Order of Friendship' সম্মানে ভূষিত করা হয়?

মৃণাল সেনকে ফ্রান্সের 'French distinction of Commander of the Order of Arts and Letters' ও রাশিয়ার 'Order of Friendship' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

৯) কোন বাংলা সিনেমাকে প্রথম ফ্রান্সের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো ও পুরস্কৃত করা হয়?

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি' (১৯৫৫) সিনেমাটিকে ১৯৫৬ সালের কানফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'Best Human Document' পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

১০) আরেকজন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমা পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে ভারত সরকার কোন সম্মানে ভূষিত করে ও তাঁর কোন সিনেমা ১৯৭৪ সালে শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য জাতীয় পুরস্কার রজত কমল পুরস্কার পায়?

ঋত্বিক ঘটককে ভারত সরকার ১৯৭০ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করে ও তার সিনেমা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য জাতীয় পুরস্কার রজত কমল পায়। ১৯৯০ সালে তার সিনেমাগুলিকে সংরক্ষণ করার কাজ শুরু হয় ও তার সিনেমার নানা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করলে এই প্রথম ঋত্বিক ঘটক তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে পৌঁছনো শুরু করেন। তার কিছু সিনেমার প্রভাব পরবর্তীকালে নানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালকের সিনেমায় লক্ষ করা যায়। যেমন 'অযান্ত্রিক'(১৯৫৮) এর সঙ্গে 'হার্বি' (১৯৬৭-২০০৫) সিনেমাগুলির ও 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৮) এর সঙ্গে ফ্রাসোয়া ত্রুফো এর 'The 400 Blows' (১৯৫৯) সিনেমাটির মিল পাওয়া যায়।

১১) স্টিফেন স্পিলবার্গের 'ইটি' সিনেমাটি সত্যজিত রায়ের কোন স্ক্রিপ্টের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়?

সত্যজিত রায় ১৯৬৭ সালে স্ক্রিপ্ট লেখেন যা থেকে 'দ্য অ্যালিয়েন' বলে একটি সিনেমা হওয়ার কথা থাকলেও পরে নানা কারণে সিনেমাটি আর তৈরি হয়নি। স্টিফেন স্পিলবার্গের 'ইটি' সিনেমাটি সত্যজিত রায়ের এই স্ক্রিপ্টের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

১২) ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০১১ সালে বাংলা সিনেমার কোন দিকপাল অভিনেতাকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হয়?

ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০১১ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার' দেওয়া হয়।

১৩) বাংলা সিনেমা জগতে কোন অভিনেতাকে 'মহানায়ক' উপাধি দেওয়া হয়েছে?

বাংলা সিনেমা জগতে উত্তম কুমারকে 'মহানায়ক' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

ক্যুইজ

১) চোখের লেন্সে কোন প্রোটিন থাকে?
২) গাপ্পি, গাম্বুসিয়া মাছগুলি ভারতে আমদানীর কারণ কী?
৩) ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়া কোথায় ঘটে?
৪) মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোশ কী?
৫) কেলভিন চক্র প্রথম কোন উদ্ভিদে আবিষ্কৃত হয়?
৬) পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা পরস্পর কী ধরনের অঙ্গ?
৭) কোন শ্রেণির প্রাণীর দেহে সরলতম হৃদ্‌পিন্ড আছে?
৮) উদ্ভিদ কোশের প্লাস্টিড আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী?
৯) কোন উদ্ভিদের চোষক মূল আছে?
১০) টাইগার মশকুইটো কাকে বলে?
১১) সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশা কে আবিষ্কার করেন?
১২) চোয়ালবিহীন একটি প্রাণীর নাম কী?
১৩) বহুসংখ্যক বীজপত্র রয়েছে কোন বীজে?
১৪) উদ্ভিদের বর্ষবলয় গঠিত হয় কী থেকে?
১৫) সবচেয়ে বড় ভাইরাস কী?
১৬) বৃতি ও দলমণ্ডল আলাদা করা যায় না কোন ফুলে?
১৭) কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কাকে বলে?
১৮) জিম্বাবুয়ে দেশের নামের অর্থ কী?
১৯) ভারত ও ভুটানের সংযোগকারী সীমান্ত শহরটির নাম কী?
২০) এলাহাবাদের প্রাচীন নাম কী?
২১) অরোরা বোররালিসের ঔজ্জ্বল্য কী কারণে বাড়ে?

২২) বিশ্বের বৃহত্তম অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম কী?
২৩) কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি?
২৪) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উৎস কোন দেশে?
২৫) কোন পাখির ডিম সবচেয়ে বড়?
২৬) ক্লোরোফর্ম তৈরির জন্য কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
২৭) এককোষী প্রাণী ইউগ্লিনার দেহে কী ধরনের পুষ্টি দেখা যায়?
২৮) ঘষা কাচকে অস্বচ্ছ দেখায় কেন?
২৯) যে মিশ্রণ দিয়ে খুব কম উষ্ণতার সৃষ্টি করা যায় তাকে কী বলে?
৩০) কাচের ওপর লেখার জন্য কোন অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়?
৩১) দন্ত চিকিৎসকরা কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করেন?
৩২) বৈদ্যুতিক বালবের ভিতরে কোন গ্যাস থাকে?
৩৩) আপেল গাছের রেচন পদার্থের নাম কী?
৩৪) কোন পাচক রসে কোনও উৎসেচক থাকে না?
৩৫) কোন হরমোন ব্যাঙাচি রূপান্তরে সাহায্য করে?
৩৬) র‍্যাফাইড কোন গাছে পাওয়া যায়?
৩৭) সংশ্লেষের ফলে সৃষ্ট জাইগোটকে কী বলে?
৩৮) কোন প্রাণীর দেহে নার্ভ রিং দেখা যায়?
৩৯) কোন উদ্ভিদ বায়ুদূষণ নির্দেশ করে?
৪০) পেনিসিলিয়াম কোন জাতীয় অণুজীব?

উত্তর: ১) ক্রিস্টালিন। ২) মশার লার্ভা দমন। ৩) মাইটোকন্ড্রিয়ার স্ট্রোমায়। ৪) লিম্ফোসাইট। ৫) ক্লোরেল্লা। ৬) সমবৃত্তি অঙ্গ। ৭) মাছ। ৮) বিজ্ঞানী স্কিমপার। ৯) স্বর্ণলতা। ১০) এডিস মশাকে। ১১) বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান। ১২) হ্যাগফিস। ১৩) পাইনাস। ১৪) গৌন জাইলেম। ১৫) ভ্যারিওলা। ১৬) রজনীগন্ধা। ১৭) রাইবোজোম। ১৮) পাথরের বাড়ি। ১৯) ফুন্টশোলিং। ২০) প্রয়াগ। ২১) চৌম্বক ঝঞ্ঝার কারণে। ২২) আর্কিটেউথিস। ২৩) টাংস্টেন। ২৪) জার্মানি। ২৫) উটপাখি। ২৬) মিথেন। ২৭) মৃতজীবী। ২৮) ঘষা কাচ অমসৃণ বলে আপতিত আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। ২৯) সমসত্ত্ব মিশ্রণ। ৩০) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ৩১) অবতল দর্পণ। ৩২) নাইট্রোজেন। ৩৩) ম্যালিক অ্যাসিড। ৩৪) পিত্তরস। ৩৫) থাইরক্সিন। ৩৬) কচু। ৩৭) জুস্পোর। ৩৮) কেঁচো। ৩৯) লাইকেন। ৪০) উপকারী ছত্রাক।

এডু অ্যাডভাইস

সময়ের কাজ সময় করো

‘স্বপ্ন, স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন, স্বপ্নকে শুধু ভাবনায় পরিণত করো, ভাবনাকে কাজে নিয়ে এসো।’

এ পি জে আবদুল কালাম।

শুধুমাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে, সারা বছর ধরে suggestion বা প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করে যাওয়াকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই যথেষ্ট মনে করি না। কারণ ভালোর কি শেষ আছে? শিক্ষা কি সীমিত ক্ষেত্র? শিক্ষাক্ষেত্র হল একটি উন্মুক্ত মহাকাশ। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই তিনটি শ্রেণি জীবনের মূল ভিত্তি। এই তিনটি শ্রেণিতে গোড়াপত্তন যাদের যত মজবুত তাদের ভিত তত বেশি শক্ত হবে। না হলে ‘গোড়ায় গলদ’ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই গলদ যাতে তোমাদের মধ্যে না থাকে তাই সময় থাকতে সময়ের কাজ সময়েই করে ফেলা ভালো। যদি সময়কালে সেগুলি চিহ্নিত করে শুধরে নেওয়া যায় তাহলে তোমাদেরই ভালো হবে। তখন একজন সক্ষম পরিক্ষার্থীরূপে নির্ভয়ে খোলামনে পরীক্ষা দিতে পারবে। সব কটি বিষয়ে Lettar Marks কোনও মতেই অসম্ভব নয়। বর্তমানে প্রচুর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে স্টার পাচ্ছে। কেমন করে সম্ভব হচ্ছে? প্রবাদে আছে, ‘পাগলেও নাকি আপনা বোঝ বোঝে, তবে তোমরা কেন পারবে না?’ চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। তোমরা কেন পিছিয়ে থাকবে? কোনটা চাও? সিদ্ধান্ত তোমাদের নিজেদের হাতে? সেই লক্ষ্যেই আমার ঐকান্তিক প্রয়াস। তোমাদের সাফল্যই শিক্ষকের সাফল্য, তোমাদের ব্যর্থতা শিক্ষকের ব্যর্থতা।

তোমরা যারা দরিদ্র প্রতিভাবান ও অসমর্থ পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী, যারা বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও, তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই নিবেদন। তোমাদের যে ভুল গুলি আমার শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতার খাতায় জমা পড়ে আছে, সেগুলি ছোট ছোট আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে তোমাদের কাছে তুলে ধরতে ধরা হল। সেগুলি গতানুগতিক পঠনপাঠনের বাইরে নয় উপদেশমূলক, যা তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। অবশ্যই তা শিক্ষার সহায়ক এবং উপকৃত হবার যোগ্য। উপরে উল্লেখিত প্রথম তিনটি শ্রেণির গুরুত্ব, যা পরবর্তী নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে বিশদে শেখানো হয়। কিন্তু এই তিনটি শ্রেণির গুরুত্ব এখন কেউ দেয় না, মাথায় রাখে না, অবহেলা করে। অথচ দেখেছি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন জানা, উত্তর কমন, তবুও সাজিয়ে লিখতে অক্ষম। বহু আলোচিত কমন পাওয়ার আশায় ‘দিশাহারা’ ও পরনির্ভর হয়ে পড়ছে, নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। নিজস্ব অভিরুচি অভিমত গড়ে তুলতে পারছে না। অথচ নবম – দশম শ্রেণির বিশেষ করে ‘গ্রামার ও ভোকাবুলারি’ এবং ‘রাইটিং স্কিল’ বিভাগে (২০+৩০) মোট ৯০-এর মধ্যে ৫০ নম্বরই সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই এই বিষয়টি উপেক্ষা করে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে থাকে। প্রাইভেট শিক্ষকহীন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা এদিকে গুরুত্ব দিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হবে।

তোমাদের পাঠ্যসূচিতে এমন কিছুই নেই যা সপ্তম শ্রেণিতে শিখেছ, কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে পাবে না, বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে সেটি পড়নি, শেখানো হয়নি। আবার নবম শ্রেণিতে তার কিছুই পাবে না। এমনটা কখনোই তোমাদের পাঠ্যক্রমে নেই। সিলেবাস যতই পরিবর্তন হোক না কেন তা ভারসাম্য, সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়। সুতরাং জানা অংশটিকে ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করেই অজানা বিষয়টিকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত্ব করে জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করে নিয়ে যাওয়াই সকল ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য। এই serial learning system-এ কোনওই negative marking নেই। তার প্রশ্নই ওঠে না। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক যে পালনীয় এই কর্তব্যে ফাঁকি দিলে নিজেরাই সেই ফাঁকির ফাঁদে পড়ে পিছিয়ে পড়বে। ব্যর্থতা তো আসবেই। তা কি তোমরা চাও? পৃথিবীতে কেউ তা চায় না। অবশেষে বলি, শিক্ষা হল সার্বিক চরিত্র গঠনের সাধনা।। struggle for existence এবং survival of the fittest পড়নি? তাই ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ ।

Becon-এর উক্তিতে ইতি টানছি—
“Reading makes a full man
Writing, an exact man,
Speaking, a ready man.”

প্রফুল্লকুমার সরকার
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)
গড়ালবাড়ি, জলপাইগুড়ি

সন্তানকে শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে হবে

(প্রথম পাতার পর)

এই ধরনের তুলনা হয়। কিন্তু এরকম তুলনা করা উচিত নয়। এতে তার মনের উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা। তাই শিশুদের মনোভাব বুঝেই তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করুন। অন্যের বাচ্চা কী করছে সেই তুলনা টেনে এনে নিজের বাচ্চাকে শাসন করবেন না। তাতে আপনার সন্তানই মনোকষ্টতে ভুগতে পারে এটা খেয়াল রাখা দরকার।

আশা করা যায় একজন অভিভাবক হিসেবে আপনি আপনার শিশুর জন্য যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটি অবশ্যই সঠিক হবে। কিন্তু নিজের কোনও সিদ্ধান্ত তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। দরকার হলে প্রয়োজনে তাকে বুঝিয়ে বলুন কেন আপনি এই কথাটা তাকে বলছেন। পজিটিভ দিকগুলি তার সামনে তুলে ধরুন।

পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তার ওপর অযথা বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। ঘরে তার জন্য একটি রুটিন তৈরি করে দিন। সেখানে সবকিছু নির্দিষ্ট করে দিন যে সে কোন দিন কোন সময়ে কী কী করবে। এতে ছোট থেকে তার মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সেটিকে সে পালন করবে। কারণ অভ্যাস সব সময় শিশুবয়স থেকেই তৈরি করে দেওয়া ভালো।

মাঝে মধ্যে জন্মদিন বা কোনও বিশেষ দিন ছাড়া তাকে কোনও উপহার দিন। সেইসঙ্গে তার ভালো কাজের প্রশংসা করুন। এতে শিশুমনে ভালো প্রভাব পড়বে। মাঝেমধ্যে কাছেপিঠে কোথাও সন্তানকে নিয়ে ঘুরে আসুন। এই ধরনের আচরণে বাবা-মা-এর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

সন্তানের সামনে বাবা-মায়ের কোনও রকম অসংযত আচরণ করা চলবে না। এতে সন্তানের মনের উপর কুপ্রভাব পড়তে পারে। মনে রাখবেন আপনার সন্তান যা দেখবে সেটাকেই সঠিক বলে মনে করবে। তাই সন্তানকে নীতিপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নিজেদের দায়িত্ববান এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জেনে রাখতে পারো

অবাক পৃথিবী

পৃথিবীতে কত কিছু ঘটেছে আর ঘটছে। সবকিছুই সত্যি, কিন্তু যেহেতু সবকিছু আমরা দেখতে পাই না বা টের পাই না তাই সেসব শুনলে আমরা অবাক হই। ইতিহাসেও এমন কত তথ্য লুকিয়ে রয়েছে যা আমাদের অবাক করতে পারে। আমরা এসবের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করি। এসব তথ্য আমাদের চমকে দেয়। কিন্তু ইতিহাস, পরিসংখ্যান, বিজ্ঞান এসব আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আজ আমরা এরকমই কিছু তথ্য জানব।

গত সপ্তাহের পর

- আইসল্যান্ড দেশটির কোনও সেনাবাহিনী নেই এবং এটি একটি অন্যতম শান্তিপূর্ণ দেশ।
- পটেটো চিপসের প্যাকেটে যে বাতাস ভর্তি থাকে তা আসলে নাইট্রোজেন গ্যাস। যা চিপসকে শক্ত মুড়মুড়ে রাখে এবং জাহাজে পরিবহণের সময় ভেঙে না যায়।
- চিন দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩১ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি অধিবাসী দাঁত মাজে না।
- আমরা যখন একটা পদক্ষেপ নেই তখন প্রায় ২০০টি পেশি ব্যবহার করে থাকি।
- পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র প্রাণী যে গাছ কেটে কাগজ তৈরি করে এবং সেই কাগজের উপর লেখে গাছ লাগাও প্রাণ বাচাও।
- আমরা একসঙ্গে নাকের দুটো ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিই না। এক সময়ে একটিই ব্যবহার করি। প্রতি দু’ঘণ্টা অন্তর পরিবর্তন করি।
- আমাদের চোখের কর্ণিয়া হল একমাত্র অংশ যা সরাসরি বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে সক্ষম।
- মহাকাশের গন্ধ গলিত লোহা থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার মতো।
- রাশিয়ার মস্কো অভিযানের সময় হিটলারের গোপন পরিকল্পনা ছিল সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করা এবং মস্কোকে একটা হ্রদ তৈরি করা।
- চাঁদের মাটিতে এখনও পর্যন্ত কোনও মহিলা পদার্পণ করেননি।
- পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের নাম ডেনমার্ক। এবং সবচেয়ে অশান্তিপূর্ণ দেশ ভেনেজুয়েলা।
- পৃথিবীতে প্রায় ৫০০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে।
- সৌদি আরব এবং ভেনেজুয়েলাতে পানীয় জলের চেয়ে পেট্রোলের দাম কম।
- একটা সিগারেট খাওয়ার অর্থ এগারো মিনিট আয়ু কমে যাওয়া।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই ২০১৭

প্রাকৃতিক বিস্ময়

রক্তিম ঝরনা

রক্তের রং লাল। সেই লালের ধারা বইছে অ্যান্টার্টিকায়। অবিশ্বাস্য এই রক্তস্রোত বিশ্বের আর কোথাও নেই। অ্যান্টার্টিকায় এই লাল টকটকে ঝরনা নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের কৌতূহল ছিল। একসময় একে ঘিরে তৈরি হয়েছে বহু মিথ। অনেকে মানতেন এটি রাক্ষসের নগরী। তবে আধুনিক বিজ্ঞান সেই মিথ ভেঙে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন এই রক্তের মতো লাল জলের ঝরনার পেছনে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতি। ১৯১১ সালে এই রক্ত ঝরনা আবিষ্কৃত হয়। ঝরনাটি প্রায় পাঁচ ধাপে নেমে আসছে বলে একে পাঁচতলা ঝরনা বলেও ডাকা হয়।

সৌরজগতের সব গ্রহের মধ্যে সুন্দর আমাদের পৃথিবী। সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য পৃথিবীকে আকর্ষণীয় করেছে। মানুষ পৃথিবীর অনবদ্য রূপের স্বাদ পেতে ছুটে যায় দেশ থেকে দেশে। কখনও কখনও সেই সৌন্দর্য হয়ে ওঠে বর্ণনাতীত। মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। কোথাও সমুদ্র তীরে তারার দল নেমে আসে, কোথাও রক্ত লাল ঝরনা ছুটে যায়, কোথাও আবার আকাশ ছেঁয়ে রঙিন আলোর ঝলকানি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক আয়নাখ্যাত স্থানটি রয়েছে বলিভিয়ায়। দৃশ্যত এখানে আকাশ ও মাটি মিশে গেছে।

প্রাকৃতিক আয়না! সেও আবার হয় নাকি? পৃথিবীর নান্দনিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নমুনা প্রাকৃতিক আয়নাখ্যাত 'সালার

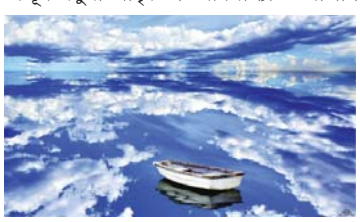

দে ইউনি'। আদতে এটি সমতল লবণ খনি। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে তা। দৃশ্যত আকাশ ও মাটি কোনওটাই নেই এখানে। এমনভাবে আকাশের প্রতিচ্ছবি স্বচ্ছ লবণ সমতলে এসে পড়েছে তা দেখে দ্বিধায় পড়ে যায় মন। বুঝতেই পারা যায় না কোনটি সত্যিকারের আকাশ। এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের আধার রয়েছে বলিভিয়ায়। বিশ্বের লাখ লাখ পর্যটক অনিন্দ্য সুন্দর এই বিস্ময় উপভোগ করতে ছুটে আসে এখানে। পৃথিবীর আয়না বলিভিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল প্রায় ১০,৫৮২ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

আনুমানিক ৪০,০০০ বছরের পুরনো লেক মিনচিন। এটি প্রধানত শুকনো ও ভরাট একটি মৃত লেক হয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই লেকের শুকনো অংশে রয়েছে প্রচুর লবণের স্তূপ। গবেষকদের মতে, এখানে জমে থাকা লবণের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন টন। তবে এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য রয়েছে মাত্র ২৫,০০০ টন। লেকের স্বচ্ছ জলে প্রকৃতির পুরো চেহারা আয়নার মতো ভেসে ওঠে।

জলতলে বন

পুরো বন জলের নীচে ডুবে আছে। এই অভাবনীয় বনটি রয়েছে কাজাখিস্তানে। তিয়ান শান পর্বতকে ঘিরে থাকা বনটি আছে আলমাটি শহর থেকে প্রায় ১২৯ কিলোমিটার দূরে। ১৯১১ সালের ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পের পর এই লেকটি তৈরি হয়। আশপাশের পাহাড় ধসে বসে যায় পুরো অঞ্চলটির। এখানে থাকা বন চাপা পড়ে পাহাড়ের নীচে। লেকের জল এসে ডুবিয়ে দেয় পুরো এলাকা। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে উঠে বনটি। জলের তলে বনের বিস্তার যে কারও চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। এই লেকের জল ভীষণ ঠান্ডা। কখনোই ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরোয় না— এতটাই ঠান্ডা। শীতকালে পুরো বন ও লেক বরফে ঢেকে যায়।

অবিশ্বাস্য গিরিখাত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলঙ্কার হিসেবে ধরা হয় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গিরিখাতকে। এখান দিয়েই বয়ে যেত খরস্রোতা কলোরোডা নদী। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রায় ২৭৭ মাইল বা ৪৪৬ কিলোমিটার লম্বা। আর কিছু কিছু জায়গায়

এই গিরিখাত প্রায় ১৮ মাইল বা ২৯ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গভীরতা প্রায় এক মাইল বা ৬০০০ ফুট। এই গিরিখাত কোনও কোনও জায়গায় ১.৬ কিমি গভীর আবার ২৯ কিমি প্রশস্ত। এই প্রকাণ্ডতাই এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম গিরিখাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই গিরিখাতটিই একসময় জলের নীচে ছিল।

আলোর স্তম্ভ

বিশ্বের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন বিস্ময় আলোর স্তম্ভ বা লাইট পিলার। পুরো আকাশজুড়ে একাধিক আলোর স্তম্ভ মাটি থেকে আকাশ ছুঁয়েছে— এই চোখ ধাঁধানো দৃশ্য ধরা পড়ে মস্কোতে। এই আলো ছুটে আসে সূর্য বা চাঁদ থেকে। লম্বালম্বিভাবে সেই আলো আকাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। স্বচ্ছ আকাশে এই দৃশ্য মানুষকে হতবাক করে দেয়। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে মস্কোতে প্রতি বছর লাখো মানুষ জড়ো হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এই আলোর পিলারগুলো বেশিরভাগ দেখা দেয়। পুরো শহর আলোকিত হয়ে ওঠে এই পিলারগুলোর আলোতে। বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়েই এই আলোর পিলারগুলো ভেসে ওঠে।

মেরুজ্যোতি

মেরুজ্যোতি অর্থাৎ অরোরা। অনেকে বলেন, মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা। অরোরা মেরু অঞ্চলের আকাশে বাহারি আলোকছটা। বায়ুমণ্ডলের থার্মোস্ফিয়ারে থাকা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার থেকে আসা চার্জিত কণিকাসমূহের সংঘর্ষের ফলেই অরোরা তৈরি হয়। বিভিন্ন রঙের অরোরা সৃষ্টি হতে পারে। মেরুজ্যোতির রং নির্ভর করে কোন গ্যাসীয় পরমাণু ইলেক্ট্রন দ্বারা উদ্দীপ্ত হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় কত শক্তি বিনিময় হচ্ছে তার ওপর। সবচেয়ে স্পষ্ট অরোরা দেখা যায় আলাস্কা, কানাডা, এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু অঞ্চল, কানাডিয়ান সীমান্ত, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরসীমায়ও কয়েকবার অরোরা দেখা যায়।

আগ্নেয়গিরির বজ্রপাত

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৫৫০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এসব জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এরা প্রায়শই জেগে ওঠে। আর জেগে উঠলেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিশ্বে অনেক আশ্চর্যজনক আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যেগুলো তাদের ভয়ানক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আগ্নেয়গিরির ভয়ানক রূপ অগ্ন্যুৎপাত হলেও বিস্ময় জাগায় আগ্নেয়গিরির বজ্রপাতের দৃশ্য। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক ও ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য এটি। অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত পাথরের সঙ্গে ছাই, ভলকানিক কোলাইড তীব্র বেগে ছুটে আসে। তখন সৃষ্টি হয় কালো মেঘ। আগ্নেয়গিরি চূড়াতেই প্রলয়ঙ্করী বজ্রপাত ঘটে।

তারার সাগর

ভাদো দ্বীপ। মালদ্বীপের এই দ্বীপ পৃথিবীর অন্য সব দ্বীপগুলোর মতো নয়। কারণ সূর্য ডুবতেই এই দ্বীপের সমুদ্রতট ভরে ওঠে আলোয়। দেখে মনে হয়, আকাশ থেকে তারা খসে পড়ছে এই সমুদ্রে আর সমুদ্রের ঢেউ সেই তারাগুলো ভাসিয়ে এনে জড়ো করছে তীরে। তাই একে বলা হয় তারার সাগর। সমুদ্রের নীল ঢেউয়ে ভাসতে থাকা এই তারাগুলো আসলে জৈবিক আলো। এগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি প্লাঙ্কটন। যেগুলো রাতের আঁধারে জ্বলজ্বল করে। সামুদ্রিক প্লাঙ্কটনগুলো নীল রঙের দ্যুতি ছড়ায়। বায়োলুমিনেস বলে এদের ডাকা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে এই জ্বলজ্বলে প্লাঙ্কটনগুলো ডায়নোফ্ল্যাগরেটস প্রজাতির।

সাতরঙা ইউক্যালিপটাস

রামধনু বা সাতরঙা ইউক্যালিপটাস প্রকৃতির মন মাতানো এই বিস্ময়। প্রকৃতিতে নানা প্রজাতির গাছ রয়েছে। ইউক্যালিপটাস হিসেবে সাতরঙা গাছের প্রজাতি এই একটিই রয়েছে গোটা পৃথিবীতে। এটি বেশ লম্বা। এই বিশেষ রামধনুওয়ালা ইউক্যালিপটাস শুধু দেখা যায় নিউ ব্রিটেন, নিউগিনি, কেরাম, সুলাওয়াসি এবং মাইন্ডনোতে। একাধিক রঙের গাছ হিসেবে এর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদেরও মুগ্ধ করেছে গাছটি। গাছটির বাকলে রঙের ছড়াছড়ি। বাইরের বাকলে এত রঙের ছড়াছড়ি হলেও বাকল ছাড়ালে ভিতরে গাঢ় সবুজ কাণ্ডের দেখা মেলে। তবে এর ভিতরে নীল, গোলাপি, কমলা আর মেরুণ কাণ্ড!